Syllabus for BCS (Written) Examination
Bangladesh Affairs -1 (Compulsory)
Subject Code: 005

Chapter	Topic	পাঠ্য বইয়ের অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
01	Geography of Bangladesh that should include topographical features of different areas/regions and their developments over time.	০১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি	০৩
02	Demographic features including ethnic and cultural diversity.	০২. জনতত্ত্ব ও সংস্কৃতি	৩২
03	History and culture of Bangladesh from ancient to recent times.	০৩. আবহমান বাংলার ইতিহাস	৫৭
05	Bangladesh's environment and nature and challenges and prospects with particular emphasis on conservation. preservation and sustainability	০৬. পরিবেশ, প্রকৃতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	১৩৮
06	Natural resources of Bangladesh with focus on their sustainable harnessing and management.	০৭. বাংলাদেশের সম্পদ	১৬৫
12	Contemporary Communication, ICT, Role of Media.	০৯. টেকসই উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ [প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ]	২১৩
	Right to Information (RTI), E-Governance.	[ই-গভর্ন্যান্স]	২২৮
15	Gender issues and Development in Bangladesh	০৮. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন [নারীর ক্ষমতায়ন]	২০০
16	**The Liberation War and its Background**	০৪. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট	
	Language Movement 1952	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন	৮০
	1954 Election	যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন	৮৬
	Six-Point Movement, 1966	ছয় দফা কর্মসূচি	৯৩
	Mass upsurge 1968-69	গণ-অভ্যুত্থান	৯৪
	General elections 1970	১৯৭০ সালের নির্বাচন	৯৬
	Non-cooperation Movement, 1971	অসহযোগ আন্দোলন	৯৭
	Bangabandhu's historic speech of 7th March.	৭ মার্চের ভাষণ	৯৮
	The Liberation War	০৫. মহান মুক্তিযুদ্ধ	
	Formation and functions of Mujibnagar government	অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার	১০২
	Role of major powers and of the UN	মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্ব	১১৭
	Surrender of Pakistani Army	পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ	১১১
	Bangabandhu's return to liberated Bangladesh.	শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	১৩২
	Withdrawal of Indian armed forces from Bangladesh	ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার	১৩২

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-০১: বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি	
১.১	বাংলাদেশের অবস্থান ও সীমানা	০৩
১.২	বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি	০৫
১.৩	বঙ্গোপসাগর, সমুদ্র বিজয় ও সমুদ্র অর্থনীতি	১২
১.৪	বাংলাদেশের মাটি	১৬
১.৫	বাংলাদেশের জলাভূমি	১৮
১.৬	বাংলাদেশের দ্বীপসমূহ	২১
১.৭	ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা	২৪
	অধ্যায়-০২: জনতত্ত্ব ও সংস্কৃতি	
২.১	জনতত্ত্ব (Demography)	৩২
২.২	সংস্কৃতি	৪৭
	অধ্যায়-০৩: আবহমান বাংলার ইতিহাস	
৩.১	প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস	৫৭
৩.২	প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ	৫৯
৩.৩	বাংলায় মুসলিম শাসন	৬১
৩.৪	উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন	৬৩
৩.৫	বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব লাভ	৬৪
৩.৬	উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব লাভ	৬৬
৩.৭	কোম্পানি আমলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন	৬৮
৩.৮	ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ	৭০
	অধ্যায়-০৪: মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট	
৪.১	পাকিস্তান: ধারণা ও বিভ্রান্তি	৭৭
৪.২	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন	৮০
৪.৩	যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন	৮৬
৪.৪	পাকিস্তানের সংবিধান ও সামরিক শাসন	৮৯
৪.৫	আইয়ুবের অপশাসন ও বাঙালির জেগে ওঠা	৯১
৪.৬	ছয় দফা কর্মসূচি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা	৯৩
৪.৭	গণ-অভ্যুত্থান	৯৪
৪.৮	১৯৭০ সালের নির্বাচন	৯৬
৪.৯	উত্তাল মার্চ ও ২৫ মার্চের গণহত্যা	৯৭
৪.১০	বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা	৯৯

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-০৫: মহান মুক্তিযুদ্ধ	
৫.১	সশস্ত্র গণপ্রতিরোধ ও অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার	১০২
৫.২	মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল	১০৪
৫.৩	চূড়ান্ত বিজয় ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ	১১১
৫.৪	মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা	১১৩
৫.৫	মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্ব	১১৭
৫.৬	মুক্তিযুদ্ধে জনমানুষের অংশগ্রহণ	১২৫
	অধ্যায়-০৬: পরিবেশ, প্রকৃতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	
৬.১	বাংলাদেশের পরিবেশ	১৩৮
৬.২	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ	১৪২
৬.৩	জলবায়ু পরিবর্তন	১৪৭
৬.৪	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা	১৫৩
৬.৫	সবুজ অর্থনীতি (Green Economy)	১৫৫
৬.৬	পানি আগ্রাসন ও বাংলাদেশ	১৫৬
	অধ্যায়-০৭: বাংলাদেশের সম্পদ	
৭.১	কৃষিজ সম্পদ	১৬৫
৭.২	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১৬৭
৭.৩	বনজ সম্পদ	১৭০
৭.৪	খনিজ সম্পদ	১৭৩
৭.৫	বিদ্যুৎ সম্পদ	১৭৭
৭.৬	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ	১৮১
	অধ্যায়-০৮: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন	
৮.১	মানবসম্পদ	১৮৮
৮.২	দারিদ্র্য বিমোচন	১৯৬
৮.৩	সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বা বেষ্টনী	১৯৮
৮.৪	নারীর ক্ষমতায়ন	২০০
৮.৫	সামাজিক সমস্যা	২০৬
	অধ্যায়-০৯: টেকসই উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ	
৯.১	টেকসই উন্নয়ন	২১৩
৯.২	প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ	২১৮
৯.৩	ই-গভর্ন্যান্স (E-Governance)	২২৮

অধ্যায় ০৩

আবহমান বাংলার ইতিহাস

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। (ক) প্রাচীন বাংলার রাঢ় জনপদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। [৩৫তম বিসিএস]
(খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কী? [৩৫তম বিসিএস]
০২। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বাঙালি সংস্কৃতি কীভাবে প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করেছে? বর্ণনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]
০৩। বাংলাদেশের ভূমি-মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করুন। এ সম্পর্ক কী ইতোমধ্যে কাম্য-পরিস্থিতি অতিক্রম করে গেছে বলে আপনি মনে করেন? [২১তম বিসিএস]
০৪। বিভিন্ন শাসনামলে গৃহীত বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল পর্যালোচনা করুন। [২০তম বিসিএস]

টীকাসমূহ

০১। নগর সভ্যতা [৩৪তম বিসিএস] ০২। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা [৩১তম বিসিএস] ০৩। লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) [১৩তম বিসিএস]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নসমূহ

০১। পলাশির যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়? [৩৩তম বিসিএস]
০২। বঙ্গদেশে কবে আর্যদের আবির্ভাব ঘটে? [৩৩তম বিসিএস]
০৩। কোন মুসলিম সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাদেশের অধিপতি হন? [৩৩তম বিসিএস]
০৪। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? [৩৩তম বিসিএস]
০৫। ঢাকায় শায়েস্তা খানের নির্মিত কীর্তিগুলো কী কী? [৩৩তম বিসিএস]
০৬। বঙ্গভঙ্গ কী? [৩৩তম বিসিএস]
০৭। লালবাগ কেল্লার নির্মাতার নাম ও নির্মাণকাল উল্লেখ করুন। [১৭তম বিসিএস]
০৮। প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন বাংলাদেশের কোন অংশ? [১৭তম বিসিএস]
০৯। বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরের কী নাম এবং বর্তমানে তা কোথায়? [১৭তম বিসিএস]
১০। বাংলাদেশের এক বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন। তিনি কে এবং তাঁর জন্মস্থান কোথায়? [১৭তম বিসিএস]
১১। 'বার ভূঁইয়া' কারা ছিলেন? [১৫তম বিসিএস]
১২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যের নাম কী? [১৩তম বিসিএস]
১৩। কার্জন হল কখন নির্মিত হয়? [১৩তম বিসিএস]
১৪। ময়নামতি বিখ্যাত কেন? [১৩তম বিসিএস]
১৫। ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে যে নতুন প্রদেশ গঠিত হয় তার নাম কী? [১৩তম বিসিএস]
১৬। প্রদেশের গভর্নর কে ছিলেন? [১৩তম বিসিএস]
১৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান উপাচার্য কে ছিলেন? [১১তম বিসিএস]
১৮। ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদের নির্মাতা কে? [১১তম বিসিএস]
১৯। ঢাকার বড় কাটরার নির্মাতা কে? [১১তম বিসিএস]
২০। শাহ সুলতান বলখী ও বাবা আদম শহীদের মাজার কোথায়? [১১তম বিসিএস]
২১। শালবন বিহার কী এবং কোথায়? [১০তম বিসিএস]
২২। উত্তরা গণভবন কোথায় অবস্থিত? [১০তম বিসিএস]
২৩। মুঘলরা ঢাকা শহরের কী নাম দেন? [১০তম বিসিএস]
২৪। মুঘলদের চট্টগ্রাম বিজয়ের পর এর কী নামকরণ করা হয়? [১০তম বিসিএস]

৩.১ প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস

উপমহাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থা

ভারতীয় উপমহাদেশ পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে ভারতীয় উপদ্বীপের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। রাশিয়াকে বাদ দিয়ে গোটা ইউরোপের আয়তনের সমান এই এলাকার আয়তন। ভৌগোলিক, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে এটি ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লোকের বাস এখানে। এই বিশাল এলাকাটি ইতিহাসের খুব কম সময়ের জন্যই একটিমাত্র শাসকের অধীনে ছিল এবং তা-ও পুরোপুরি নয়। বর্তমানে এলাকাটি পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমার রাষ্ট্রগুলিতে বিভক্ত। কিন্তু প্রতিটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই আঞ্চলিক প্রভেদের পরিমাণ বিপুল। তাই ভারতীয় উপমহাদেশের একটি সাধারণ সামগ্রিক ইতিহাস বর্ণনা করা দুরূহ। এই উপমহাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হলো-

মৌর্য সাম্রাজ্য (খ্রি.পূ. ৩২১–খ্রি.পূ. ১৮৫)

মৌর্য সাম্রাজ্য প্রাচীন ভারতে লৌহ যুগের একটি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ছিল। মৌর্য রাজবংশ দ্বারা শাসিত এই সাম্রাজ্য ৩২১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৮৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বদিকে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে অবস্থিত মগধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। মৌর্য সাম্রাজ্য তৎকালীন যুগের অন্যতম বৃহত্তম সাম্রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হতো, শুধু তাই নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য কখনো তৈরি হয়নি। বর্তমান মানচিত্রের নিরিখে এই সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয়, পূর্বে আসাম, পশ্চিমে বালুচিস্তান ও হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও বিন্দুসার এই সাম্রাজ্যকে দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত করেন এবং অশোক কলিঙ্গ রাজ্য জয় করে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। অশোকের মৃত্যুর পরবর্তী পঞ্চাশ বছর দশরথ, সম্প্রতি, শালিশুক, দেববর্মণ, শতধনবান ও বৃহদ্রথ এই ছয় জন সম্রাটের রাজত্বকালে মৌর্য সাম্রাজ্য দুর্বল হতে থাকে। শেষ সম্রাট বৃহদ্রথ নিজ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ কর্তৃক নিহত হওয়ার পর মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন এবং শুঙ্গ সাম্রাজ্যের সূচনা ঘটে।

গুপ্ত সাম্রাজ্য (৩২০–৫৫০ খ্রি.)

গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল একটি প্রাচীন ভারতীয় সাম্রাজ্য। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ৩২০ থেকে ৫৫০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে এই সাম্রাজ্য প্রসারিত ছিল। মহারাজ শ্রীগুপ্ত ধ্রুপদী সভ্যতা-র আদর্শে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্ত শাসকদের সময়/শাসনামলে ভারতে যে শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপিত হয়েছিল, তার ফলশ্রুতিতে দেশ বৈজ্ঞানিক ও শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করতে সক্ষম হয়। গুপ্তযুগকে বলা হয় ভারতের স্বর্ণযুগ। এই যুগ ছিল আবিষ্কার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাস্তুবিদ্যা, শিল্প, ন্যায়শাস্ত্র, সাহিত্য, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্ম ও দর্শনের বিশেষ উৎকর্ষের যুগ; বর্তমান হিন্দু সংস্কৃতি মূলত এই যুগেরই ফসল। গুপ্ত যুগের আমলে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি যেমন কালিদাস, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, বিষ্ণু শর্মা -এর আবির্ভাব হয়েছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সম্রাট। তাদের সাম্রাজ্য সীমা দক্ষিণ ভারতেও প্রসার লাভ করে।

গুপ্ত–পরবর্তী বাংলা

পঞ্চম শতকে দুর্ধর্ষ পাহাড়ি জাতি হুন ও ষষ্ঠ শতকে মালবের যশোবর্মণের আক্রমণের ফলে ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের গুপ্ত শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সারা উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। এভাবে গুপ্তদের পর সমগ্র উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। সেই সুযোগে বাংলাদেশে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এর একটি হলো বঙ্গ। এর অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম-বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে। দ্বিতীয় রাজ্যের নাম গৌড়। এর অবস্থান ছিল পশ্চিম ও উত্তর বাংলা নিয়ে।

স্বাধীন বঙ্গ ও গৌড় রাজ্য

ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি হুনদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে বঙ্গ ও গৌড় নামে ২টি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে।

১. **বঙ্গ রাজ্য:** দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে ছিল এর অবস্থান। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিন জন রাজা 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য শাসন করতেন।

২. **গৌড় রাজ্য:** বাংলার পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চল জুড়ে ছিল এর অবস্থান। গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোনো অঞ্চলের শাসনকর্তাকে বলা হতো **'মহাসামন্ত'**। শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন মহাসামন্ত। শশাঙ্ক ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে গৌড় অঞ্চলের ক্ষমতা দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে গৌড় নামে একত্র করেন। শশাঙ্কের উপাধি ছিল রাজাধিরাজ। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা। শশাঙ্ক রাজধানী স্থাপন করেন কর্ণসুবর্ণে। এটি ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়।

মাৎস্যন্যায় (৭ম–৮ম শতক)

৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিল না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, অন্যদিকে ভূস্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে। কেন্দ্রীয় শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিল না। এ অরাজকতার সময়কালকে পাল তাম্রশাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'মাৎস্যন্যায়' বলে। পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলে 'মাৎস্যন্যায়'। বাংলার সবল অধিপতিরা এমন করে ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করছিলেন। এ অরাজকতার যুগ চলে একশ বছরব্যাপী। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি এ অরাজকতার অবসান ঘটে পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে গোপালের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে মাৎস্যন্যায়ের চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

পাল সাম্রাজ্য (৮ম শতাব্দী–১২শ শতাব্দী)

পাল সাম্রাজ্য ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ধ্রুপদী পরবর্তী যুগের একটি সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের উৎসস্থল ছিল বাংলা অঞ্চল। পাল সাম্রাজ্যের নামকরণ করা হয় এই সাম্রাজ্যের শাসক রাজবংশের নামানুসারে। পাল সম্রাটেরা বৌদ্ধধর্মের মহাযান ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিলেন। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের সম্রাট পদে গোপালের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটে। পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ধর্মপাল এবং সর্বশেষ রাজা ছিলেন মদনপাল। অধুনা বাংলা ও বিহার ভূখণ্ড ছিল পাল সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র। এই সাম্রাজ্যের প্রধান শহরগুলি ছিল পাটলীপুত্র, বিক্রমপুর, রামাবতী (বরেন্দ্র), মুঙ্গের, তাম্রলিপ্ত ও জগদ্দল।

পাল সম্রাটরা ছিলেন প্রাজ্ঞ কূটনীতিবিদ ও যুদ্ধজয়ী। তাদের সেনাবাহিনীর অধীনে ছিল একটি বৃহৎ যুদ্ধহস্তী বাহিনী। তাদের নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক ও প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করত। পাল সম্রাটরা ছিলেন ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্পের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। তারা একাধিক বৃহদায়তন মন্দির ও মঠ নির্মাণ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সোমপুর মহাবিহার। তারা নালন্দা ও বিক্রমশিলা মহাবিহারের পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। তাদের রাজত্বকালেই প্রাচীন বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটে।

সেন শাসন (১২শ শতাব্দী– ১৩শ শতাব্দী)

বাংলায় পাল যুগের অবসানের পর বারো শতকের শেষের দিকে সেন বংশের শাসনের সূচনা হয়। সেন বংশের শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হেমন্ত সেন হলেও বিজয় সেনের সময়েই বাংলাদেশে সেন বংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয় সেন ছিলেন সেন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। সেন বংশের সর্বশেষ শাসক লক্ষ্মণ সেন ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে নদীয়া ত্যাগ করেন এবং বাংলায় সেন বংশের শাসনের পতন হয়।

৩.২ প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ

'বাংলা' নামে প্রাচীনযুগে কোনো অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল না। সমগ্র বাংলা জুড়ে ছিল অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা জনপদ এবং সেগুলো পরিচিত ছিল বিভিন্ন নামে। এদের প্রত্যেকটিই ছিল স্বতন্ত্র ও পৃথক। চতুর্থ শতক হতে গুপ্ত যুগ, গুপ্ত পরবর্তী যুগ, পাল, সেন প্রভৃতি আমলের শিলালিপি ও সাহিত্য গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার ১৬টি জনপদের নাম পাওয়া যায় (বাংলায় ছিল ১০টি)। বঙ্গ, গৌড়, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, রাঢ়, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, দণ্ডভুক্তি ও বরেন্দ্র প্রভৃতি নামে জনপদ ছিল। এসব জনপদের নির্দিষ্ট কোনো সীমা ছিল না। যুদ্ধ-বিগ্রহ বা প্রাকৃতিক কারণে বিভিন্ন সময়ে জনপদগুলোর সীমা ও ব্যাপ্তি পরিবর্তিত হতো।

পুণ্ড্র

'পৌন্ড্রিক' শব্দ থেকে 'পুণ্ড্র' নামের উৎপত্তি। এর অর্থ- আখ বা চিনি। প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে পুরাতন জনপদের নাম পুণ্ড্র। বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অবস্থানভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পুণ্ড্র জনপদ। পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানীর নাম পুণ্ড্রনগর। বর্তমান বগুড়া শহরের অদূরে করতোয়া নদীর তীরে পুণ্ড্রনগর অবস্থিত। ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ড্র ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত হয়। পরবর্তী কালে এর নাম মহাস্থানগড় হয়। গুপ্ত যুগে (৪র্থ-৬ষ্ঠ শতকে) পুণ্ড্রনগর ছিল গুপ্তদের প্রাদেশিক রাজধানী। এখানে গুপ্তদের সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা ছিল। পুণ্ড্র জনপদে একটি উন্নত নগর সভ্যতা ছিল। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাজ্য। সম্ভবত মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (খ্রি.পূ. ২৭৩-২৩২ অব্দ) প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্য স্বাধীন সত্তা হারায়।

বরেন্দ্র

এটি উত্তরবঙ্গের একটি জনপদ। ধারণা করা হয়, পুণ্ড্রের একটি অংশ জুড়ে অর্থাৎ বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক এলাকা এবং সম্ভবত পাবনা জেলাজুড়ে বরেন্দ্র বিস্তৃত ছিল।

বঙ্গ

বঙ্গ অত্যন্ত প্রাচীন জনপদ। সম্ভবত আর্য যুগের আগে বা শুরুতে (খ্রি. পূ. ১৫০০-৬০০) বঙ্গ জাতি এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে জনপদ-রাষ্ট্র তৈরি করে। মহাভারত ও রামায়ণে শক্তিশালী বঙ্গ রাজ্যের কথা উল্লেখ আছে। বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে বঙ্গ জনপদ অবস্থিত ছিল। বঙ্গরাজ্যের পশ্চিমে করতোয়া নদী, উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হয়েছে। বৃহত্তর বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালির কিয়দংশ নিয়ে বঙ্গ গঠিত হয়েছিল। এখানে যারা বসবাস করত তাদের 'বঙ্গ' জনগোষ্ঠী বলা হত। 'বঙ্গ' থেকে বাঙালি জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল। পাঠান আমলে সমগ্র বাংলা বঙ্গ নামে ঐক্যবদ্ধ হয়। ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' উপনিষদে বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গৌড়

খ্রিষ্টপূর্ব ৭৩০ অব্দে মালদহ অঞ্চলে ভোজ বংশীয় গৌড় নামক জনৈক ব্যক্তি (শ্রুতি অনুসারে) যে রাজ্যের পত্তন করেছিলেন কালক্রমে তাই গৌড় রাজ্য নামে পরিচিত হয়। বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে শুরু করে পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বহরমপুর এলাকায় এটি বিস্তৃত ছিল। এক কালে এর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ)। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড় উল্লিখিত অঞ্চলসমূহকে নিয়ে একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ রাজ্যের রাজারা ছিলেন ক্ষমতাবান। গৌড়েশ্বর কথাটি এখনও সেই ক্ষমতারই ইঙ্গিত প্রদান করে। সপ্তম শতকে শশাঙ্কের অধীন গৌড় রাজ্য বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে গৌড়ের নাম লখনৌতি (প্রদেশের নামে) পরিচিতি পায়। পাণিনির গ্রন্থে সর্বপ্রথম গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে এ জনপদের শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাঢ়

ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীর হতে গঙ্গা নদীর দক্ষিণাঞ্চল রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত। অজয় নদী রাঢ় অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। উত্তর রাঢ় বর্তমান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলি ও মালদহ জেলা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, রাঢ় হলো ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের একটি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অঞ্চল। এটি পশ্চিমে ছোটোনাগপুর মালভূমি ও পূর্বে গাঙ্গেয় বদ্বীপ পর্যন্ত প্রসারিত। রাঢ় অঞ্চলের সীমানা সম্পর্কে প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে নানা পরস্পরবিরোধী তথ্য পাওয়া গেলেও, বোঝা যায় যে মূলত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই এই অঞ্চলের অবস্থিতি ছিল।

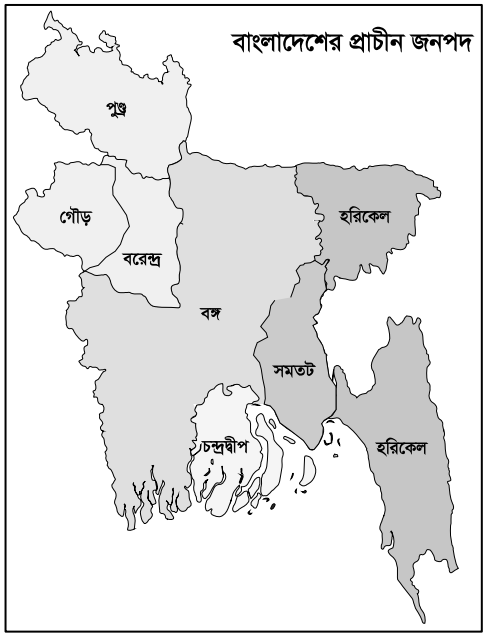

সমতট

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার প্রাচীন জনপদের নাম সমতট। এটি প্রাচীন বঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের একটি বিশাল রাজ্য। মধ্যবাংলার কিছু অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ অঞ্চলটি ছিল আর্দ্র নিম্নভূমি। বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশ, বাংলাদেশের বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চল সমতট নামে পরিচিত ছিল। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে (কারও কারও মতে সপ্তম শতাব্দী) দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই জনপদের বিস্তৃতি ছিল প্রায় ৫০০ মাইল এবং বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা জেলা ছিল সমতটের অন্যতম অংশ। রাজা রাজভট্টের (৭ম শতকে) অন্যতম রাজধানী ছিল কর্মান্ত বা ত্রিপুরা জেলার ময়নামতির অদূরে বড়কামতা।

হরিকেল

হরিকেল প্রাচ্যদেশের পূর্বতম সীমানায় অবস্থিত ছিল বলে বিভিন্ন সূত্র ও বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার কারো কারো লিপিতে হরিকেলের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বর্তমান চট্টগ্রামেরও অংশ খুঁজে পাওয়া যায়। সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে ধরে নেয়া যায় যে, পূর্বে শ্রীহট্ট (সিলেট) থেকে চট্টগ্রামের অংশ বিশেষ পর্যন্ত হরিকেল জনপদ বিস্তৃত ছিল। যদিও মধ্যখানে সমতট রাজ্যের অবস্থিতি ছিল- যা কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। আসলে তখন জনপদ বা রাষ্ট্রের কোথাও কোথাও বেশ শিথিল অবস্থা বিরাজ করছিল। তা ছাড়া বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল তিনটি পৃথক জনপদ হলেও এরা খুব নিকট প্রতিবেশী হওয়ায় কখনো কখনো কোনো কোনো এলাকায় অন্য জনপদের প্রভাব বিরাজ করত বলে ধারণা করা হয়। 'ডাকার্ণব' নামক গ্রন্থে হরিকেলকে চৌষট্টিটি তান্ত্রিক পীঠের একটি পীঠ বলা হয়। এখানে নারীদের প্রশংসা করে গ্রন্থ লেখা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, হরিকেলে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। হরিকেলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবও ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত দুইটি শিলালিপিতে হরিকেল সিলেটের সঙ্গে সমর্থক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

চন্দ্রদ্বীপ

প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জনপদ চন্দ্রদ্বীপ। এর অবস্থান ছিল বলেশ্বর ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে। বর্তমান বরিশাল জেলাই ছিল চন্দ্রদ্বীপের মূল ভূখণ্ড। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারকালে রাজা দনুজমর্দন 'চন্দ্রদ্বীপ' নামের একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজ্যটি চন্দ্রদ্বীপ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। চন্দ্রদ্বীপ নামের আগে এ অঞ্চলটির নাম ছিল 'বাকলা'। তাই একপর্যায় অঞ্চলটি বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিতি পায়। ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত অঞ্চলটি বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামেই পরিচিত। আগে চন্দ্রদ্বীপ অসংখ্য নদী-নালায় ভরপুর ছিল। বর্তমানে মেঘনা, কীর্তনখোলা, তেঁতুলিয়া, আড়িয়াল খাঁ, সুগন্ধা, সন্ধ্যা, কালাবদর, ঝুনাহার নদী অঞ্চলটিকে ঘিরে রেখেছে।

গঙ্গারিডই

প্রাচীন বাংলার জনপদ বা রাজ্য হিসেবে গঙ্গারিডই এর অস্তিত্ব আমরা জানতে পাই গ্রিক লেখকদের লেখনী থেকে। গ্রিক লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ৩২৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন বাংলায় গঙ্গারিডই নামে এক শক্তিশালী রাজ্যের অবস্থান ছিল। কিন্তু বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন কোনো গ্রন্থে এ রাজ্যটি সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আধুনিক পণ্ডিতদের অনেকেই ধারণা করেন, রাজ্যটি গঙ্গা নদীর তীরবর্তী কোনো এক অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

তাম্রলিপ্ত

তাম্রলিপ্ত ছিল প্রাচীন বাংলার একটি বিখ্যাত বন্দর। মহাভারতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ লক্ষ করা যায়। মেদিনীপুর জেলায় এ বন্দরটি অবস্থিত ছিল। টলেমীর ভৌগোলিক বিবরণীতেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। এ বন্দরনগরী থেকে সমুদ্র পথে সিংহল, জাভা দ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যের আদান- প্রদান চলত। আধুনিককালের অনেক পণ্ডিত তাম্রলিপ্তকে প্রাচীন বাংলার একটি জনপদ হিসেবেই গণ্য করেন।

৩.৩ বাংলায় মুসলিম শাসন

উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সাথে বাংলার ইতিহাস পরিক্রমায় কিছুটা ভিন্নতা আছে। গজনভিদ ও ঘুরীদের আমলে বাংলায় মুসলমানদের কোনও অবস্থানই ছিল না। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

তুর্কি শাসন

তেরো শতকের শুরুতে (১২০৪ সালে) তুর্কি বীর ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজি বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। ইতিহাসে তিনি বখতিয়ার খলজি নামেই বেশি পরিচিত। মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটালেও তাঁর মৃত্যুর কারণে তিনি এখানকার শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে যেতে পারেননি। ফলে ইবনে বখতিয়ারের মৃত্যুর পর বাংলায় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের নিকট পরাজিত ও নিহত গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজির মৃত্যুর পর ১২২৭ খ্রি. হতে ১২৮৭ খ্রি. পর্যন্ত ষাট বছর বাংলা দিল্লি সালতানাতের একটি প্রদেশ ছিল। এ সময় দিল্লির সুলতান কর্তৃক মনোনীত ১৫ জন প্রাদেশিক শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেন। এদের মধ্যে দশ জন ছিলেন মামলুক বা দাস। তবে তারা সবাই তুর্কি ছিলেন বলে এ যুগকে তুর্কি শাসনামল বলাই যুক্তিসংগত। বাংলায় তুর্কি শাসনের সময় দিল্লিতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বিরাজমান ছিল। বাংলার মতো দূরবর্তী প্রদেশের প্রতি দিল্লির সুলতানদের তৎপর হওয়ার সুযোগ ছিল না। বাংলার তুর্কি শাসকগণ অনেকটা স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করতেন।

স্বাধীন সুলতানি শাসন

১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ের দিল্লি সালতানাত নিযুক্ত শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যু হয়। বাহরাম খানের বর্মরক্ষক ছিলেন 'ফখরা' নামের একজন রাজকর্মচারী। প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং 'ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ' নাম নিয়ে সোনারগাঁয়ের সিংহাসনে বসেন। এভাবেই সূচনা হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের। দিল্লির মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের এ সময় বাংলার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ ছিল না। তাই, সোনারগাঁয়ে স্বাধীনতার সূচনা হলেও ধীরে ধীরে স্বাধীন অঞ্চলের সীমা বিস্তৃত হতে থাকে। পরবর্তী দুইশ বছর এ স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।

বাংলার এই দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতা দৃঢ় ভিত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন দীর্ঘস্থায়ী ছিল; অবশ্য মাঝখানে স্থানীয় রাজা গণেশের উত্থান ঘটেছিল। ইলিয়াস শাহী শাসনের পর ক্ষণস্থায়ী হাবশী শাসন এবং হাবশী শাসনের অবসান ঘটিয়ে উত্থান ঘটে হুসেন শাহী বংশের। আলাউদ্দিন হুসেন শাহী ছিলেন এই বংশের শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ও নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ সুলতান। ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী শাসনামল বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে বাংলার একক রাজনৈতিক সত্তা প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়। বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ এই সময়কে করেছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ গৌড় দখল করলে বাংলার দুইশ বছরের স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান ঘটে।

আফগান শাসন

হোসেন শাহী আমলের অবসানের পর বাংলায় আফগানদের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারা বাংলায় ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় ছয় মাস (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) এবং ১৫৩৯ থেকে ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন শের শাহ শূর। শের শাহ শূর প্রথমবার ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দের হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে বাংলা অধিকার করেন এবং সেখানে শূর বংশীয় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মাহমুদ শাহের সাহায্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন এবং সেখানে তিনি প্রায় আট মাস অবস্থান করেন। দিল্লির সিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃঘাতী ষড়যন্ত্র শুরু হলে হুমায়ুন বাংলা ছেড়ে দিল্লির অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে শেরখান অতর্কিতে আক্রমণ করে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি বাংলার শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলীকে হত্যা করে গৌড় অধিকার করেন (অক্টোবর, ১৫৩৯ খ্রি.)। অতঃপর তিনি বাংলায় নতুন এক শাসনব্যবস্থা সামরিক ব্যবস্থার পরিবর্তে বেসামরিক শাসন কায়েম করেন। শেরশাহ বাংলাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি সরকারের শাসনভার একজন আমীনের ওপর অর্পণ করেন। পরবর্তীতে নানা পরিক্রমার মধ্য দিয়ে সম্রাট আকবর ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ কররানিকে পরাজিত করে আফগানদের হাত থেকে বাংলার ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

মুঘল শাসন: সুবাহ বাংলা

১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল ও আফগানদের মধ্যে সংঘটিত রাজমহলের যুদ্ধের ফলে বাংলায় আফগান শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সূচিত হয় মুঘল শাসন। তবে সমগ্র বাংলায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সময় লাগে। নদীমাতৃক বাংলা প্রদেশের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জমিদারদের প্রতিরোধের কারণে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুঘল শাসন বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত একটি সুবা অর্থাৎ প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে আকবরের শাসনকাল হতেই বাংলায় সুবাদার নিয়োগ শুরু হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সুবাদার ইসলাম খান 'বারোভুঁইয়া' নামে পরিচিত বাংলার জমিদারদের কঠোর হস্তে দমন করে এদেশে মুঘল শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন।

বারো ভূঁইয়া

সম্রাট আকবর সমগ্র বাংলার ওপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বাংলার বড় বড় জমিদার মুঘলদের অধীনতা মেনে নেননি। জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। তাঁদের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর ছিল। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁরা একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে এ জমিদারগণ বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত। এ 'বারো' বলতে বারোজনের সংখ্যা বোঝায় না। ধারণা করা হয় অনির্দিষ্ট সংখ্যক জমিদারদের বোঝাতেই 'বারো' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলার ইতিহাসে বারোভুঁইয়াদের আবির্ভাব ষোলো শতকের মাঝামাঝি থেকে সতেরো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। আলোচ্য সময়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যাঁরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাঁরাই বারো ভূঁইয়া। এছাড়াও, বঙ্গদেশে আরও অনেক ছোটখাটো জমিদার ছিলেন, তাঁরাও মুঘলদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান। কিন্তু পরে তাঁরা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। বারোভূঁইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

বারোভুঁইয়াদের নাম	এলাকার নাম	বারোভুঁইয়াদের নাম	এলাকার নাম
ঈসা খান, মুসা খান	ঢাকা জেলার অর্ধাংশ, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার কিছু অংশ	বীর হামির	বিষ্ণুপুর (বাকুড়া)
		লক্ষণ মাণিক্য	ভুলুয়া (নোয়াখালী)
চাঁদ রায় ও কেদার রায়	শ্রীপুর (বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ)	পরমানন্দ রায়	চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল)
বাহাদুর গাজি	ভাওয়াল	বিনোদ রায়, মধু রায়	চান্দপ্রতাপ (মানিকগঞ্জ)
সোনা গাজি	সরাইল (ত্রিপুরার উত্তর সীমায়)	মুকুন্দরাম, সত্রজিৎ	ভূষণা (ফরিদপুর)
ওসমান খান	বোকাইনগর (সিলেট)	রাজা কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র	বরিশাল জেলার অংশবিশেষ

মুঘল সুবেদারি

সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে বারোভূঁইয়াদের দমন করে সমগ্র বাংলায় সুবেদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় থেকে বেশ কয়েকজন সুবাদার বাংলা শাসন করেন। এদের মধ্যে ইসলাম খান, মীর জুমলা ও শায়েস্তা খান বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাদের শাসনকালে বাংলা খুব সমৃদ্ধশালী হয়েছিল।

নবাবি শাসন

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর কোনো কোনো সুবা স্বাধীন হয়ে যায়। বাংলাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বিশেষ করে মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে বাংলায় নবাবি আমলের সূচনা হয়। মুর্শিদকুলী খানের প্রাথমিক জীবন খুবই চমকপ্রদ। তিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে করতলব খান উপাধি দিয়ে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত করেন। পরে তিনি সুবেদার হন। মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল যুগোপযোগী। তিনি অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য না করে সঠিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন।

মুর্শিদকুলী খানের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে কন্যা জিনাত-উন-নেসার স্বামী সুজাউদ্দীন খান (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন। সুজাউদ্দীন খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খান নবাব নিযুক্ত হন। কিন্তু সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে বিহারের আলীবর্দী খান বিদ্রোহ করেন। সরফরাজ খান এতে পরাজিত ও নিহত হন। মুঘোলদের অনুমোদন ছাড়াই আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। নিজের নবাবির উত্তরাধিকার হিসেবে তিনি তার পৌত্র সিরাজকে মনোনীত করেন। নবাব পরিবারের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাই শুধু নয়, গোটা ভারতেরই স্বাধীনতা হারানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৩.৪ উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন

সপ্তম শতক থেকে এ অঞ্চলের সঙ্গে আরব বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল একচেটিয়া। তারা বাণিজ্য করত মূলত সমুদ্রপথে। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল উসমানীয় তুর্কিরা দখল করে নেয়। ফলে উপমহাদেশের সাথে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভিন্ন জলপথ আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মূলত এ কারণেই ইউরোপীয় শক্তিগুলো সমুদ্রপথে উপমহাদেশে আসার অভিযান শুরু করে। ১৪৮৭ সালে পর্তুগিজ নাবিক বার্থালোমিউ দিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার প্রথম জলপথ আবিষ্কার করেন। তার দেখানো পথ ধরে বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠী ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করে।

পর্তুগিজ

পর্তুগিজদের মধ্যে যে দুঃসাহসী নাবিক প্রথম সমুদ্রপথে ভারতের পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন, তিনি ভাস্কো-ডা-গামা। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ মে তার এ উপমহাদেশে আগমন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। পর্তুগিজরা ব্যবসা-বাণিজ্যকে মূলধন করে এদেশে এলেও ক্রমে ক্রমে তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা কালিকট, চৌল, বোম্বাই, সালসেটি, বেসিন, কোচিন, গোয়া, দমন, নিউ প্রভৃতি অঞ্চলে কুঠি স্থাপন এবং ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওয়ে শুদঘাটি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। উড়িষ্যা ও বাংলার কিছু অঞ্চলেও তারা বসতি সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়। প্রথম আগত ইউরোপীয়ান বাণিজ্যিক দল হলেও তাদের অপকর্ম ও দস্যুতার কারণে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপের ঘাঁটি দখল করে, তাদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। তাছাড়া পর্তুগিজরা এদেশে আগত ইউরোপীয় অন্যান্য শক্তির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে এদেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।

ওলন্দাজ

হল্যান্ডের অধিবাসীদের ওলন্দাজ বা ডাচ বলা হয়। তারা 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে বাণিজ্যের উদ্দেশে ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে উপমহাদেশে আসে। তারা কালিকট, নাগাপট্টম, বাংলার চুঁচুড়া, বাকুড়া, বালাসোর, কাশিমবাজার এবং বরানগরে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। কিন্তু অপর ইউরোপীয় শক্তি ইংরেজদের সঙ্গে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ শুরু হয় এবং একই সঙ্গে তারা বাংলার শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ওলন্দাজরা বিদারার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত সকল বাণিজ্যকেন্দ্র গুটিয়ে তারা এদেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।

দিনেমার

ডেনমার্কের অধিবাসীদের দিনেমার বলা হয়। দিনেমারদের একদল বণিক বাণিজ্য করার জন্য 'ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে। ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে তারা দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর এবং ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শ্রীরামপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু এদেশে লাভজনক ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়ে ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিক সফলতা ছাড়াই দিনেমাররা এদেশ ত্যাগ করে।

ইংরেজ

প্রাচ্যের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের মতো ইংরেজ বণিকদেরকেও এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত করে; ইংল্যান্ডের একদল বণিক 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি বণিক সংঘ গঠন করে। এই সংঘটি ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে ১৫ বছর মেয়াদি একচেটিয়া বাণিজ্য করার সনদপত্র লাভ করে। প্রাচ্যে বাণিজ্য করার সনদপত্রটি নিয়ে কোম্পানি বাণিজ্যিক সুবিধা পাওয়ার আশায় প্রথমে সম্রাট আকবর এবং পরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে এসে উপস্থিত হয়। জাহাঙ্গীরের অনুমতি লাভ করে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। স্বল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ, মসলিপট্টমে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে এদেশে তাদের ভিত্তি মজবুত করে ফেলে।

এরপর তারা বাংলার বালাসোরে বাণিজ্য কুঠি এবং করমন্ডল (মাদ্রাজ) উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। বাংলার সুবেদার শাহ সুজার অনুমতি নিয়ে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হুগলিতে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এছাড়া ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কাশিমবাজার, ঢাকা, মালদহেও তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করতে সক্ষম হয়। বোম্বাই শহরটিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডে কিনে নেয়। পরবর্তীকালে এই বোম্বাই শহরই কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। কোম্পানি ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নাম অনুসারে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে। ধীরে ধীরে এটি ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং রাজনৈতিক স্বার্থ বিস্তারের শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায় যখন দিল্লীর সম্রাট ফররুখশিয়ার তাদের বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন। এই সঙ্গে নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকারও তারা লাভ করে। সম্রাটের এই ফরমানকে ইংরেজ ঐতিহাসিক গুরমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মহাসনদ বা ম্যাগনা কার্টা বলে উল্লেখ করেন। এই অধিকার লাভ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসর হতে থাকে।

ফরাসি

ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশে আগত সর্বশেষ ইউরোপীয় বণিক কোম্পানি। ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক কোম্পানিটি সর্বপ্রথম সুরাটে ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে এবং পরের বছর মুসলিপট্টমে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এছাড়া ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীতে গড়ে তোলে ফরাসি উপনিবেশ। ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে ফরাসিরা তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলায় সম্প্রসারিত করে। ফরাসি বণিকরা যখন এদেশে বাণিজ্য করতে আসে ইংরেজ বণিকরা তখন ব্যবসা বাণিজ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এ অবস্থায় ফরাসিদের ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ইংরেজদের মতো ফরাসিরাও এ দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে থাকে। ফলে এই দুই ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল, উন্নত রণকৌশলের কাছে শেষ পর্যন্ত ফরাসিরা পরাজিত হয়। তাছাড়া বাংলার নবাবের পক্ষ অবলম্বন করায় এবং ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্য তাদেরকে আরও পর্যুদস্ত করে ফেলে। স্বাভাবিকভাবে বাংলায় অবস্থিত ফরাসি কুঠিগুলো ইংরেজদের দখলে চলে যায়। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকের যুদ্ধসমূহে ফরাসি কোম্পানির পরাজয় তাদের এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। প্রথমে পর্তুগিজ পরে ওলন্দাজ শক্তির পতন, সর্বশেষে ফরাসিদের পরাজয় ভারতে ইংরেজ শক্তির উত্থানের পথ সুগম করে এবং এ অঞ্চলে তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়।

৩.৫ বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব লাভ

উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে পলাশির যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোম্পানির গভর্নর কর্তৃক বাংলার নবাবকে প্রতারণাপূর্ণ উপায়ে হত্যা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলার দেওয়ানি লাভ সমগ্র উপমহাদেশের কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের বীজ বুনে দিয়েছিল। কারণ বাংলা অধিকারের পর কোম্পানি বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমে বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানিও লাভ করে যা সমগ্র ভারতের শাসক হওয়ার পথ খুলে দিয়েছিল।

পলাশির যুদ্ধ

পলাশির যুদ্ধ বাংলা তথা এ উপমহাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশির আম্রকাননে ইংরেজদের সাথে নবাব সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে নবাব পরাজিত হন। নবাবের পরাজয়েরে ফলে বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়।

যুদ্ধের কারণ

সিরাজের বিরুদ্ধের ষড়যন্ত্র

সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনে আরোহণকে আলীবর্দী খানের অপর দুই কন্যা সহজে মেনে নিতে না পেরে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে। এতে ইন্ধন যোগায় ঘষেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ। সিরাজউদ্দৌলা কৌশলে তাঁর খালা ঘষেটি বেগমকে প্রাসাদে নজরবন্দি করেন ও খালাতো ভাই শওকত জঙ্গকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে পূর্ণিয়া দখল করেন। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে পারিবারিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলেও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র নতুনভাবে শুরু হয়। নবাব হওয়ার পর সিরাজউদ্দৌলাকে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে যে সম্মানি পাঠানোর কথা তা পাঠাতে অস্বীকৃতি জানানো।

নবাবের আদেশ অমান্য

নবাব আলীবর্দী খানের সময়ে ইংরেজগণ বাণিজ্য করার অনুমতি পেলেও দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি পায়নি। কিন্তু সিরাজের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা কোলকাতায় এবং ফরাসিরা চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ শুরু করলে সিরাজ তাদের দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করতে আদেশ দেন। ফরাসিরা এ আদেশ মান্য করলেও ইংরেজরা তা অমান্য করে। ফলে নবাব তাদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

ইংরেজ কর্তৃক শওকত জঙ্গকে সাহায্য

নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে খালা ঘষেটি বেগম ও পূর্ণিয়ার শাসক শওকত জঙ্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে তাদের সমর্থন করেন। এতে নবাব ইংরেজদের উপর অসন্তুষ্ট হন।

ইংরেজ কর্তৃক কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দান

ঘষেটি বেগমের পক্ষ অবলম্বনকারী রাজা রাজাবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ও তাঁর পরিবার প্রচুর ধনদৌলতসহ কোলকাতায় পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করে। নবাব সরাসরি কৃষ্ণদাসকে তাঁর নিকট সমর্পণের জন্য নারায়ণ সিংহকে দূত হিসেবে ইংরেজদের কাছে পাঠান। কিন্তু, ইংরেজ গভর্নর নবাবের দূতকে অপমানিত করে বের করে দেন ও কৃষ্ণদাসকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন। ফলে নবাবের ধৈর্যের বাঁধন ছিঁড়ে যায়।

ইংরেজদের ষড়যন্ত্র

ইংরেজদের একের পর এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও অবাধ্যতা নবাবকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৭৫৬ সালের জুন মাসের শুরুতে নবাব কলকাতা দখল করে নেন। নবাবের অতর্কিত আক্রমণে ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। হলওয়েলসহ বেশকিছু ইংরেজ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে নবাবকে হেয় করার জন্য হলওয়েল এক মিথ্যা প্রচারণা চালায় যা ইতিহাসে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত। এতে বলা হয় যে, ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ১৪.১০ ফুট প্রস্থ ছোট একটি ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে রাখা হয়। এতে প্রচণ্ড গরমে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ১২৩ জনের মৃত্যু হয়। এই মিথ্যা প্রচার মাদ্রাজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে উত্তেজিত হয়ে কলকাতা দখল করার জন্য ওয়াটসন ও ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় চলে আসে। তারা নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদকে পরাজিত করে কলকাতা দখল করে নেয়। নবাব তাঁর চারদিকে ষড়যন্ত্র ও শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে নতজানু ও অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হন। এটি ইতিহাসে 'আলীনগর সন্ধি' নামে খ্যাত।

আলীনগর সন্ধিতে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পর ক্লাইভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি পায়। নবাবের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপে সংঘটিত সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা ফরাসিদের চন্দনগর কুঠি দখল করে নেয়। নবাব এ অবস্থায় ফরাসিদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে ইংরেজদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা নেন। এতে ক্লাইভ ক্ষুব্ধ হয়ে নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই ষড়যন্ত্রে ক্লাইভের সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবসায়ী ধনকুবের জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ, প্রধান সেনাপতি মীর জাফর প্রমুখ।

ক্লাইভের যুদ্ধ ঘোষণা

ষড়যন্ত্র যখন একেবারে পাকা, তখন ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে সন্ধি ভঙ্গের মিথ্যা অজুহাতে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পলাশির যুদ্ধ বাংলা তথা এ উপমহাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশির আমবাগানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতোমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ তার অবস্থান সুদৃঢ় করে সন্ধি ভঙ্গের অজুহাতে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নবাবের পক্ষে দেশপ্রেমিক মীর মদন, মোহন লাল এবং ফরাসি সেনাপতি সিন ফ্রে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে মীর মদন নিহত হন। নবাবের বিজয় আসন্ন জেনে মীর জাফর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়। মীর মদনের মৃত্যু ও মীর জাফরের অসহযোগিতা নবাবকে বিচলিত করে। নবাবের সেনাপতি মীর জাফর যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করে নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল। নবাব কোরআন স্পর্শ করিয়ে শপথ নেয়ালেও মীর জাফরের ষড়যন্ত্র থামেনি। নবাবের সৈন্যরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেই সময় মীর জাফরের ইঙ্গিতে ইংরেজ সৈন্যরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যার অনিবার্য পরিণতি নবাবের পরাজয়।

নবাবের পতনের কারণ

পলাশির যুদ্ধে নবাব বাহিনীর পরাজয়ের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল-

- মীরজাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল নবাবের পতনের প্রধান কারণ। বিজয়ের মুহূর্তে প্রধান সেনাপতি হিসাবে সে নবাবকে ভুল পরামর্শ দেয় ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।
- তরুণ নবাবের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাব এবং মাতামহের অত্যধিক স্নেহ প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত পালিত হওয়ায় সিরাজের চরিত্রে কঠোরতা ও দৃঢ়তার অভাব ছিল। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে বিপদজ্জনক পরিস্থিতির মুখে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং ষড়যন্ত্রের খবর পাওয়া সত্ত্বেও তিনি দুর্বলতার কারণে কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হন নি।
- যুদ্ধক্ষেত্রে সুনিশ্চিত বিজয়কে উপেক্ষা করে নবাবের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা তাঁর সমরনীতির অপরিপক্কতার ও পরনির্ভরশীলতার পরিচয় বহন করে যা তাঁর পতনকে ত্বরান্বিত করে।
- সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক রবার্ট ক্লাইভ সূক্ষ্ম কূটনীতি, উন্নত রণকৌশল এবং রণসম্ভারে নবাব অপেক্ষা অনেক বেশি পারদর্শী ছিলেন। ফলে ক্লাইভের নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় অবধারিত ছিল।

পলাশির যুদ্ধের ফলাফল

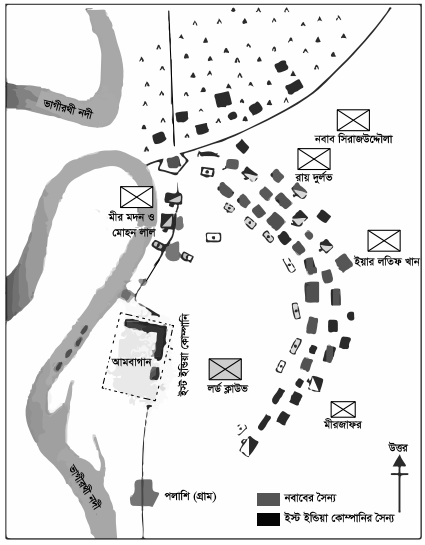

উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ একটি বেদনাবহুল খণ্ড যুদ্ধ হলেও এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। বিশেষ করে, এ যুদ্ধের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

- ঐতিহাসিক আর.সি. মজুমদার বলেন, "পলাশির যুদ্ধ বাংলা তথা সমগ্র উপমহাদেশে ইংরেজদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। কালক্রমে বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রি:) তারা নবাব মীর কাসিম ও মুঘোল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে পরাজিত করে সমগ্র উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে।"
- পলাশির যুদ্ধের ফলে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার অকাল মৃত্যু হলে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য দীর্ঘদিনের জন্য অস্তমিত হয়।
- এ যুদ্ধের ফলে মীরজাফর নামেমাত্র নবাব হলেও প্রকৃত ক্ষমতা রইলো ক্লাইভের হাতে।
- পলাশির যুদ্ধের পর উপমহাদেশে ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হলেও তারা নতুন নবাবের কাছ থেকে নগদ এক কোটি টাকা এবং চব্বিশ পরগনার বিশাল জমিদারি লাভ করেন। ফলে বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের অযাচিত হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত হয়।
- এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করেন আর এদেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়।
- যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইংরেজরা বাংলাসহ দাক্ষিণাত্য হতে ফরাসি বণিকদের বিতাড়িত করে এবং একচেটিয়াভাবে উপমহাদেশের সম্পদ আহরণ ও ইংল্যান্ডে প্রেরণের ফলে এদেশের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।
- যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে জনগণের মনে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং একইসাথে কোম্পানির মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।
- পলাশির যুদ্ধের পর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে উপমহাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়।

৩.৬ উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব লাভ

পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কাছে। তখনো সমগ্র ভারতের অন্যান্য স্থানের কোম্পানি তাদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয় নি। ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধ বাংলার সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা এনে দেয় এবং বাণিজ্যিক কোম্পানি থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশের শাসক হয়ে ওঠে।

বক্সারের যুদ্ধ

পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর বাংলার মসনদ লাভ করে। কিন্তু রাজকোষ শূন্য থাকায় মীরজাফর তার ব্যক্তিগত স্বর্ণালংকার, হীরা, জহরত ও মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রি করে প্রতিশ্রুত দেড়কোটি টাকা দিতে ও দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। ফলে সে দেউলিয়া হয়ে ইংরেজ নির্ভর হয়ে পড়ে। এদিকে ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় সেনাবিদ্রোহ দেখা দিলে, ক্লাইভের সাহায্যে ঢাকার বিদ্রোহ দমন করা হলেও বকেয়া বেতনের দাবিতে সংঘটিত পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়নি। মীরজাফর নবাবি পেলেও প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ কিংবা ভোগ করা তার ভাগ্যে জোটেনি। এ কারণে মীরজাফর উদ্ধত ইংরেজদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করতে খানিকটা প্রয়াস নেয়। কিন্তু তার অযোগ্যতা, ওলন্দাজদের সঙ্গে পত্রালাপ এবং প্রতিশ্রুতির অনুসারে অর্থ না দেয়ার অজুহাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অস্থায়ী গভর্নর ভ্যান্সিটটির প্রস্তাবক্রমে মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করা হয় (১৭৬০ খ্রি:)।

১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত করেন। মীরকাশিম বাংলার মসনদে আরোহণ করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজদের সাথে ভবিষ্যতে তার সংঘর্ষ সুনিশ্চিত। কারণ মীরকাশিম ছিলেন মীরজাফরের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ইংরেজদের সাথে ঝগড়া করার ইচ্ছা তার না থাকলেও ইংরেজদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে থাকার মতো হীন মনোবৃত্তি তার ছিল না। তাই তিনি প্রকৃত নবাব হিসেবে দেশ শাসন করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনি দেশ, জাতি ও স্বীয় স্বার্থে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ফলে ইংরেজদের সাথে তার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পরে এবং তিনি পরপর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হন। যুদ্ধগুলিতে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়েও মীরকাশিম দমে যাননি। তিনি ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা এবং দিল্লির তৎকালীন মুঘোল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি ইংরেজ বিরোধী জোট তৈরি করেন। ১৭৬৪ সালের অক্টোবর মাসে এই তিন শক্তির মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ বক্সারের যুদ্ধ নামে খ্যাত। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ শক্তি ১৭৬৪ সালের ২৩ অক্টোবর উপরিউক্ত তিন ভারতীয় শক্তির মিলিত বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। দ্বিতীয় শাহ আলম তৎক্ষণাৎ ইংরেজ পক্ষে যোগ দেন। সুজাউদ্‌দৌল্লা রোহিলখণ্ডে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। মীরকাশিম আত্মগোপন করেন।

ফলাফল

- বক্সারের যুদ্ধ বাংলা তথা উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি সুদূর প্রসারী ফল এনে দিয়েছিল। এ যুদ্ধ পলাশির যুদ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে দিল্লির মুঘল সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করেন।

- এ যুদ্ধের ফলে মীরকাশিমের ইংরেজ বিতরণ ও স্বাধীনতা রক্ষার শেষ আশার শেষ ভরসাটুকুও ধূলিসাৎ হয় এবং উপমহাদেশে ইংরেজ প্রভাব ও মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে যায়; উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বিনা বাধায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পথ উন্মোচিত হয়।
- কোম্পানি অযোধ্যার নবাবের নিকট থেকে কারা ও এলাহাবাদ অঞ্চল দু'টি কেড়ে নেয়।
- এ যুদ্ধে কেবল মীরকাশিম পরাজিত হননি; স্বয়ং সম্রাট শাহ আলম ও সুজাউদ্দৌলাও পরাজিত হয়েছিলেন। ফলে দিল্লি থেকে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত ইংরেজদের অধীনে চলে যায়।
- এ যুদ্ধের ফলে ক্লাইভ দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি (রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব) লাভ করেন। ফলে বাংলায় ইংরেজ অধিকার আইনত স্বীকৃত হয় ও কোম্পানি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়।
- ঐতিহাসিক জেমস স্টিফেন্স বলেন, 'ব্রিটিশ শক্তির উৎপত্তি হিসেবে উপমহাদেশে পলাশির যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।' কারণ মীরকাশিমের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নবাবি আমল শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তী ঘটনাবলি ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংগঠনের যুগ।

কোম্পানির বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ

পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীরকাশিম পরাজিত হওয়ার পর ইংরেজদের গতিরোধ করার মতো শক্তি ও সাহস এদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তখন থেকেই বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজরা সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করে এবং বাংলার ভাগ্যবিধাতা হয়ে যায়।

মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সাথে চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানির প্রতিনিধি লর্ড ক্লাইভ কারা ও এলাহাবাদ জেলা দু'টি ও বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে সম্রাটের নিকট হতে ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি সনদ লাভ করেন। দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলায় শুল্কহীন অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পায়। ফলে কোম্পানির কর্মচারীদের অর্থের লোভ দিন দিন বাড়তে থাকে। অসদুপায়ে রাজস্ব আদায় ও আত্মসাৎ করলেও কোম্পানির কর্তারা কোনো পদক্ষেপ নিতেন না। এভাবে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে এদেশের মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। মূলত ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ানি প্রকৃত অর্থে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করে।

দ্বৈত শাসন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

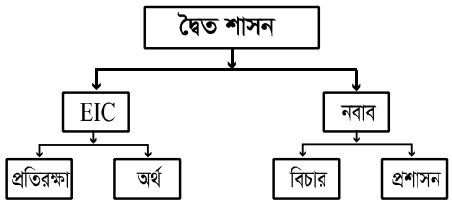

পলাশির যুদ্ধে বিজয়ের পর ইংরেজ বেনিয়ারা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের যে প্রয়াস শুরু করেছিল, তাদের দেওয়ানি ও দ্বৈত শাসন লাভের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করে। লর্ড ক্লাইভ এদেশে এক অভিনব শাসন ব্যবস্থা চালু করেন যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল কোম্পানিকে শক্তিশালী করে সম্রাট ও নবাবকে ক্ষমতাহীন করে তোলা। এতে দেওয়ানি ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা থাকে কোম্পানির হাতে এবং বিচার ও শাসনভার থাকে নবাবের হাতে। এরই নাম দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় কোম্পানি পেলো দায়িত্বহীন ক্ষমতা আর নবাব পেলো ক্ষমতাহীন দায়িত্ব। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা এদেশের জন্য কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে এনেছে বেশি। ক্ষমতা পেয়েই কোম্পানির কর্মচারীরা দেশের মানুষের উপর রাজস্বের জন্য নানাভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে থাকে। কিন্তু নবাবের হাতে কোনো ক্ষমতা না থাকায় এর বিচার সম্ভব হয়নি। ফলে দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের দারুণ ক্ষতি হয়। সামগ্রিকভাবে কৃষির অবনতি, উপরন্তু অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬ সনে) দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়, যার প্রেক্ষিতে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়।

রাজস্ব ও ভূমি ব্যবস্থাপনা: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ওয়ারেন হেস্টিংস এর প্রবর্তিত জমির পাঁচসালা ও একশালা বন্দোবস্তের ভুলত্রুটি নিরসনের জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস জমির দশশালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এই সংস্কার ২২ মার্চ, ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। এ ব্যবস্থার ফলে জমিদাররা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদান সাপেক্ষে জমির স্থায়ী মালিক হন। ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপের মাধ্যমে বাংলায় এ অবস্থার অবসান ঘটে।

বৈশিষ্ট্য

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের জমির স্থায়ী মালিকে পরিণত করে এবং জমিদাররা জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে।
- রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে জমিদার জমিদারি ভোগের চিরস্থায়ী অধিকার লাভ করে।
- এ প্রথা চালু হওয়ার ফলে জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। সরকার স্বয়ং শান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে।
- খাজনা বাকি পড়লে জমিদারদের ভূমির কিছু অংশ বিক্রি করে রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা ছিল।

ফলাফল

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। কর্নওয়ালিস জমিদার ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের মতো এদেশেও একটি জমিদার শ্রেণি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপ আর উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও তার বিকাশের ধরন এক ছিল না। ফলে কৃষকের দুরবস্থা সৃষ্টি, মহাজনি শোষণ বৃদ্ধি, সূর্যাস্ত আইন অনুসারে, নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব জমা দিতে না পারায় বহু পুরোনো জামিদারের জমিদারি হারানো, নতুন জমিদার সৃষ্টি, শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতিসহ বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৩.৭ কোম্পানি আমলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

ব্রিটিশ বিরোধী উল্লেখযোগ্য কিছু আন্দোলন/বিদ্রোহ

ফকির–সন্ন্যাসী আন্দোলন

বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। ১৭৬০ সালে প্রথম ফকিরদের নেতা মজনু শাহ ও সন্ন্যাসীদের নেতা ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। বক্সারের যুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীরা নবাব মীর কাশেমের পক্ষ অবলম্বন করে। যুদ্ধে পরাজয়ের পর ১৭৭১ সালে মজনু শাহ উত্তর বাংলায় ইংরেজবিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। ১৭৭৭-১৭৮৬ সাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় ইংরেজদের সঙ্গে মজনু শাহ বহু সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাঁর যুদ্ধকৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতি অর্থাৎ অতর্কিত আক্রমণ করে নিরাপদে সরে যাওয়া। ইংরেজদের পক্ষে তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা কখনই সম্ভব হয়নি। তিনি ১৭৮৭ সালে মৃত্যুবরণ করলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, সোবান শাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্স প্রমুখ ফকির। এই নেতারা কয়েক বছর ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন। ১৮০০ সালে তাঁরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। অপরদিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠক ১৭৮৭ সালে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে দুই সহকারীসহ নিহত হন। সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী আন্দোলনেরও অবসান ঘটে।

প্রভাব

- ব্রিটিশ বিরোধি চেতনা সৃষ্টি এবং সর্বস্তরের মানুষের মাঝে এই চেতনার বিস্তৃতি।
- ধর্ম, বর্ণ, জাতী নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়া।
- সশস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ।

চাকমা বিদ্রোহ/কার্পাস বিদ্রোহ

ইংরেজ শাসকরা বাইরের কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কার্পাস কর আদায়ের চুক্তি করে তাকে পার্বত্য অঞ্চল ইজারা দিত। ইজারাদার বিভিন্ন কৌশলে এই সরল প্রকৃতির পার্বত্য অধিবাসীদের কাছ থেকে রাজস্বের নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি তুলা আদায় করে আনত এবং চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা শাসকদের কাছে জমা দিয়ে বাকি তুলা আত্মসাৎ করত। এর পর ওই তুলা বাজারে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করত। শাসকরা রাজস্ব হিসেবে যে তুলা পেত, তা বিক্রি করে মুদ্রায় পরিণত করার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করত। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শাসকদের হাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিয়ে বাকি তুলা থেকে ফাটকাবাজি দ্বারা প্রচুর মুনাফা লুট করত। এই ব্যবস্থার ফলে পার্বত্য অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই অঞ্চলের আদিবাসীরা সমান ওজনের দ্রব্যের বিনিময় সমান ওজনের দ্রব্য নিতে অভ্যস্ত ছিল। সুতরাং তুলার ব্যাপারি দুই টাকা মূল্যের এক মণ লবণের বিনিময়ে আট টাকা মূল্যের এক মণ তুলা আত্মসাৎ করত। এভাবে কোনো একটি বা দুটি দ্রব্য ক্রয় করতেই আদিবাসীদের সব তুলা নিঃশেষ হয়ে যেত। এছাড়াও তাদের মুদ্রার মাধ্যমে কর প্রদানে বাধ্য করা। এই উভয়বিধ শোষণের ফলে এই অঞ্চলের আদিবাসীরা অনিবার্য মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়ায়। অবশেষে তারা বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হলো। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যভাগে চাকমারা প্রথমবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন চাকমা দলপতি রাজা সের দৌলত ও তাঁর সেনাপতি রামু খাঁ। প্রথম বিদ্রোহের পর রামু খাঁর পুত্র জানবকস খাঁর নেতৃত্বে ১৭৮২ সালে ও ১৭৮৪ সালে দুটি বিদ্রোহ হয়। এরপর দ্বিতীয় শের দৌলত খাঁর নেতৃত্বে ১৭৮৭ সালে আরেকটি বিদ্রোহ হয়।

তিতুমীরের সংগ্রাম

উনিশ শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজে এক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলায় তার দুইটি ধারা প্রবহমান ছিল। যার একটি ওয়াহাবি বা মুহাম্মদিয়া আন্দোলন, অপরটি ফরায়েজি আন্দোলন নামে খ্যাত। উভয় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ নির্দেশ করা। বাংলার ওয়াহাবি তিতুমীরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল। তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত তারিখ-ই-মুহাম্মদিয়া বা ওয়াহাবি আন্দোলন পরবর্তীতে কৃষক বিদ্রোহে পরিণত হয়।

১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমীর তাঁর প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন। নির্মাণ করেন শক্তিশালী এক বাঁশের কেল্লা। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী। ইংরেজ, জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমীরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে শাসক-শোষক জমিদারশ্রেণি কৃষকদের সংঘবদ্ধতা এবং তিতুমীরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সালে তিতুমীরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার এক বিশাল সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। মেজর স্কটের নেতৃত্বে এই বাহিনী তিতুমীরের নারিকেলবাড়িয়া বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান-বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে পরাজিত হয় তিতুমীরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে নিহত হন। গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। তিতুমীরের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন জমিদারদের আঁতে ঘা লাগায় তা এক সময় জমিদার বিরোধী আন্দোলন এবং পরে তা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়। এই সংগ্রামে তিতুমীর ও তার অনুসারীরা পরাজিত হলেও তা উপমহাদেশের শোষিত শ্রেণির মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

সাঁওতাল বিদ্রোহ বা সান্তাল হুলের সূচনা হয় ১৮৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বিহারের ভাগলপুর জেলায়। ইংরেজ আমলে স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ কর্মচারীদের অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়ে সাঁওতালরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র গণসংগ্রাম। তাদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় সিধু, কানু, চাঁদ, দৈব প্রমুখ। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৮৫৬ সালের নভেম্বর মাসে তা শেষ হয়। সাঁওতালরা তীর-ধনুক ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করলেও ইংরেজ বাহিনীর হাতে ছিল বন্দুক ও কামান। তারা ঘোড়া ও হাতি যুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। এ যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যসহ প্রায় ১০ হাজার সাঁওতাল যোদ্ধা নিহত হন। সাঁওতাল বিদ্রোহের লেলিহান শিখা ব্রিটিশ সরকারের মসনদ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে ইংরেজ সরকার সাঁওতালদের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করেন। ম্যাজিস্ট্রেট এডন সাহেব সাঁওতালদের আবেদন শুনে তাদের সমস্যা বিবেচনা করে আদিবাসী সাঁওতালদের জন্য ডুমকা নামে একটি জেলা বরাদ্দ করেন। এটাই সাঁওতাল পরগনা নামে পরিচিত। উপমহাদেশের ইতিহাসে এই আন্দোলন অত্যন্ত ফলপ্রসূ। ভারতের স্বাধীনতা না আনলেও এই বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতার বীজ বুনে দেয়।

নীল বিদ্রোহ

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রং করার জন্য ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। তাছাড়া আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইংরেজ বণিকদের সেখানকার নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাংলা হয়ে ওঠে নীল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে নীল চাষ শুরু হয়।

নীল চাষের জন্য নীলকররা কৃষকের সর্বোৎকৃষ্ট জমি বেছে নিত। কৃষকদের নীল চাষের জন্য অগ্রিম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করা হতো। আর একবার এই দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে যতই কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করুক না কেন, বংশপরম্পরায় কোনো দিনই ঋণ শোধ হতো না। নীল চাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের উপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। বাংলাদেশে নীলের ব্যবসা ছিল একচেটিয়া ইংরেজ বণিকদের। ফরিদপুর, যশোর, ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে ব্যাপক নীল চাষ হতো। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নীল চাষিরা ১৮৫৯ সালে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এসব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় নীলচাষিরাই। যশোরের নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নবীন মাধব ও বেণী মাধব নামে দুই ভাই। হুগলিতে নেতৃত্ব দেন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার। নদীয়ায় ছিলেন মেঘনা সর্দার এবং নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই।

কৃষকের আন্দোলনের সাথে যোগ দেয় শিক্ষিত সমাজ। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'নীলদর্পণ' নাটকের কাহিনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বাংলার সংগ্রামী কৃষকদের জয় হয়। ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের 'ইচ্ছাধীন' বলে ঘোষণা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। পরবর্তীকালে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮৯২ সালে এদেশে নীল চাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

ফরায়েজি আন্দোলন

ওয়াহাবি মতাদর্শে বিশ্বাসী হাজী শরীয়তুল্লাহ পরিচালিত আন্দোলনের নাম 'ফরায়েজি আন্দোলন'। 'ফরায়েজি' শব্দটি এসেছে 'ফরজ' শব্দ থেকে। 'ফরজ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'অবশ্য পালনীয়।' তিনি তাঁর অনুসারীদের ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত হয়ে মুসলমানদের 'ফরজ' অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কর্তব্য পালনে আহ্বান জানান। কেননা হাজী শরীয়তুল্লাহ্ লক্ষ করেন যে, মুসলমান জনগণ পিরপূজা, পিরের দরগায় ওরশ, মানত পালন এবং কবর পূজায় লিপ্ত। মুসলমানদের এসব ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনাচার এবং নৈতিক অধঃপতন হাজী শরীয়তুল্লাহ্কে বিচলিত করে তোলে। তিনি এসব পালনের ঘোর বিরোধিতা করেন। ব্রিটিশ ভারতে বিদেশি ও বিধর্মী ইংরেজ রাজত্বকে 'দারুল হারব' বা 'বিধর্মীর রাজ্য' বলে ঘোষণা করেন। তিনি মুসলমানদের পাঁচটি ফরজ পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন। এজন্যই তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের নাম 'ফরায়েজি আন্দোলন'। ফরায়েজি আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয় আবরণে একটি সংস্কার আন্দোলন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ্র আহ্বানে ফরিদপুর ও তার আশেপাশের কারিগর, কৃষক, তাঁতি, জেলে সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। তিনি লক্ষ করেন যে, এসব নিম্নবিত্তের মানুষদের উপর অত্যাচারী জমিদার ও নীলকর ইংরেজ সাহেবরা নির্যাতন ও শোষণ চালাচ্ছে। কাজেই তিনি এ শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতে সচেষ্ট হন। ফলে তিনি ধর্মীয় নেতা হলেও তাঁর উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব বর্তায়। তিনি জনগণকে জমিদার ও ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন। কিন্তু শক্তিশালী জমিদার ও নীলকরদের প্রবল আক্রমণের মুখে হাজী শরীয়তুল্লাহ্র ফরায়েজি আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাঁর পুত্র দুদু মিয়া। দুদু মিয়ার (আসল নাম পীর মুহসীন উদ্দীন আহমদ) নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন রূপ নেয় সশস্ত্র সংগ্রামে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার ও নীলকরদের হাত থেকে রক্ষা করা ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। 'জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থি' জমিদারদের অত্যাচার রোধকল্পে দুদু মিয়া আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ উক্তি করেন। ১৮৬২ সালে দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৩.৮ ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ

সিপাহি বিদ্রোহ

ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রি.) মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদী আন্দোলন বা বিদ্রোহ সংঘটিত হতো। কিন্তু এতে সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব এত ব্যাপক আকারে ঘটে যে তা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে তোলে। প্রাথমিকভাবে কোম্পানির দুঃশাসন ও নির্যাতনের শিকার দেশীয় সিপাহিরা এ বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায়। পরবর্তীতে তা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক বছর স্থায়ী এই গণবিদ্রোহে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ অংশ নেয় ও সহযোগিতা প্রদান করে। বিদেশি শাসন শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিদ্রোহের মূলে কাজ করেছিল। বিপ্লবী জনতা ব্রিটিশ শাসনকে অগ্রাহ্য করে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসক বলে ঘোষণা দেয়। তাছাড়া নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসীর রানি লক্ষীবাঈ, কুনওয়ার সিং, মৌলভী আহমদ উল্লাহ প্রমুখ নেতা গণবিপ্লবে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে বিপ্লব সফল না হলেও পরিণতিতে ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতের শাসন ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

কারণ

রাজনৈতিক কারণ

লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি এবং অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি উপমহাদেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে বিদ্রোহের সঞ্চার করে। স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা তিনি সাঁতারা, ঝাঁসি, সম্বলপুর ও নাগপুর রাজ্য দখল করেন। অযোধ্যা রাজ্যটি কুশাসনের অভিযোগে গ্রাস করা হয় এবং অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতার সাথে দখলকৃত অযোধ্যা ও নাগপুরের রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করা হয়। এর ফলে নানা সাহেব ও ঝাঁসির রানি বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং সাঁতারা ও নাগপুরের রাজপরিবারগুলো বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক কারণ

ইংরেজ কর্তৃক অযোধ্যা দখলের পর সেখানকার বহু তালুকদার জমির মালিকানা হারান। শুধু অযোধ্যা নয়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা লাভের পর দেওয়ানি অর্থ উত্তোলনের পাশাপাশি এখানকার প্রচুর সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করতে থাকে যা এখনকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুর্বল করে দেয়। এতে ভারতের মানুষ বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

সামরিক ব্যয় বৈষম্য

সৈন্য	সৈন্য সংখ্যা	ব্যয়
ইউরোপীয়	৫১ হাজার ৩১৬ জন	৫৬ লাখ ৬০ হাজার পাউন্ড
ভারতীয়	৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৫০০ জান	৯৮ লাখ পাউন্ড

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণ

শাসক ও শাসিত শ্রেণির মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকায় এখানকার হিন্দু-মুসলিম বিরোধী আইনগুলোকে ভারতের মানুষ তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হিসেবে দেখে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এছাড়া ভারতবাসীদেরকে ইংরেজরা তাদের অন্যান্য উপনিবেশের মতো খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা করত যা ভারতবাসীর আক্রোশ আরো বৃদ্ধি করেছিল।

সামরিক কারণ

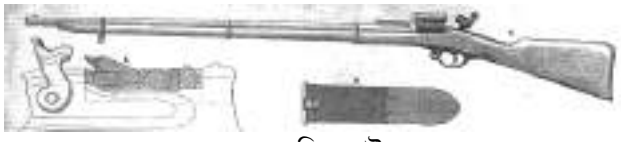
রয়েল এনফিল্ড রাইফেল

সিপাহি বিপ্লবের অন্যতম কারিগর সিপাহীদের অসন্তোষ ছিল সবচেয়ে বেশি। ভারতে কোম্পানির শাসন বজায় রাখার নিমিত্তে নিয়োজিত সৈনিকদের বেশিরভাগই ছিলেন ভারতীয় কিন্তু তাদের বেতন ভাতা ইউরোপীয়দের তুলনায় ছিল অনেক কম। তাছাড়া ভারতীয় সিপাহীদের প্রতি ইংরেজ অফিসারদের অসদাচরণ ছিল আরেকটি অন্যতম কারণ। সে সময় রয়েল এনফিল্ড রাইফেলের গ্রিজ হিসেবে গরু ও শুকরের চর্বি ব্যবহার করা হয় বলে গুজব রটে; যা হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের সৈনিকদের মধ্যে ক্ষোভ চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়।

বিদ্রোহের ঘটনা

রয়েল এনফিল্ড রাইফেল গুজবের জের ধরে ভারতের বিভিন্ন সামরিক ঘাটিতে অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুর সেনানিবাসে মঙ্গল পান্ডে নামক এক ভারতীয় সৈনিক ইংরেজি অফিসারকে জখম করা এবং সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহের ডাক দেয়ার অভিযোগে ৮ এপ্রিল তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরের সেনানিবাস অতিক্রম করে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন সেনানিবাসে ছড়িয়ে পরে। সৈনিকরা তাদের পোস্টের ইংরেজ অফিসারদের বন্দি করে নেয়। দ্রুত এই বিদ্রোহ মিরাট, কানপুর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এই বিদ্রোহে শামিল হয়। বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের বাদশা বলে ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, অযোধ্যার বেগম হজরত মহল, মৌলভি আহমদ উল্লাহসহ ক্ষুব্ধ বঞ্চিত দেশীয় রাজন্যবর্গ। বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সিপাহি ও যুদ্ধরত বিদ্রোহী, নেতারা প্রাণপণ লড়াই করে পরাজিত হন।

ফলাফল

১৮৫৭ সালের জুলাইতে ইংরেজরা কানপুর দখল করে নেয় এবং নানা সাহেবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। এসময় ভারতের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় লর্ড ক্যানিং সরাসরি বিদ্রোহের সাথে জড়িত নয় এমন ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড রহিত করেন। ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে মেজর হাডসন দিল্লি দখল করে সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে মিয়ানমারের রেঙ্গুনে নির্বাসন দেন; যদিও তার ছেলেদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। জুনে ঝাসি দখল করে ঝাসির রানি লক্ষীবাঈকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। বিদ্রোহের সাথে জড়িত সৈনিকদের বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আগস্টে রানি ভিক্টোরিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারতকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শত বছর শাসনের অবসান হয়।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে ব্যর্থ হয়। এ বিপ্লবের পেছনে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা না থাকায় ঐক্যবদ্ধ কোনো কর্মপন্থা বা সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি। দুর্বল নেতৃত্ব, আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ, উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তির অভাব, নিম্নমানের সমরাস্ত্র ও দুর্বল রণকৌশল বিদ্রোহীদের পরাজয়কে অবধারিত করে তোলে। অন্যদিকে ইংরেজদের দক্ষ নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত সামরিক শক্তি তাদের মাথায় বিজয়ের মুকুট পরিয়ে দেয়।

বঙ্গভঙ্গ

১৯০৫ সালের পূর্বে 'বাংলা প্রেসিডেন্সি' ছিল ভারতের সর্ববৃহৎ প্রদেশ। এই বৃহৎ প্রদেশটিকে ভেঙে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। ঢাকায় এ নতুন প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়। পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। এর রাজধানী হয় কলকাতা। ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা প্রদান করা হয় এবং ১৫ অক্টোবর থেকে তা কার্যকর হয়। বঙ্গভঙ্গের পর নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন এনড্রু ফ্রেজার। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনগণকে সংগঠিত করেন।

বঙ্গভঙ্গের কারণ

প্রশাসনিক কারণ

অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশ এর আয়তন ছিল প্রায় দুই লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ। একজন গভর্নরের পক্ষে এত বড় প্রদেশ শাসন করা ছিল খুবই কষ্টকর। ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে এজন্যই লর্ড কার্জন ভারত সচিবকে লিখেছিলেন যে, "একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে এত বড় ও বিশাল জনবহুল এলাকা শাসন করা সম্ভব নয়।" লর্ড কার্জনের এ লিখিত রিপোর্টের আলোকেই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে দুটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, বঙ্গভঙ্গ করে দুটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হলে সুষ্ঠু প্রশাসন গড়ে উঠবে এবং জনগণের দাবি ও সমস্যা মোকাবিলা করা সহজ হবে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ করা

১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নামক একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে বিশেষ করে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা শহর। সুচতুর ইংরেজ সরকার এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ এবং আন্দোলনকারীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য বঙ্গভঙ্গ করতে উদ্যোগী হন এবং ব্রিটিশ সরকার 'বিভেদ ও শাসন নীতি' অবলম্বন করেন।

মুসলমানদের দাবি

স্যার সলিমুল্লাহ্ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হলে পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের সুযোগ পাবে। হিন্দু সম্প্রদায় প্রভাবিত কলকাতার উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতাও হ্রাস পাবে। মুসলমান জনগণ চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করতে পারবে।

সামাজিক কারণ

ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমান সম্প্রদায় নির্মমভাবে শোষিত বঞ্চিত হতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি এবং মুসলমানদের প্রতি বৈরী নীতি অনুসরণ করতে থাকে। মুসলমানরা সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তিহীন একটি দরিদ্র, রিক্ত ও নিঃস্ব সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। সুতরাং লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের চিন্তা-ভাবনা শুরু হলে পূর্ব-বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় স্বভাবতই এর প্রতি সমর্থন জানায়। বঙ্গ বিভাগের দ্বারা পূর্ব বঙ্গের মুসলমান জনগণ তাদের হারানো সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকে।

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

রাজনৈতিক ফল

- ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও নতুন প্রদেশ গঠন পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ ও রাজনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে রাজধানী ঢাকায়। ঢাকায় গড়ে ওঠে নতুন অফিস, সচিবালয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান।
- নবগঠিত প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গের প্রথম বার্ষিকী মুসলমানরা পালন করে উৎসবমুখর চিত্তে। অন্যদিকে হিন্দুরা একে শোক ও বেদনার দিন হিসেবে পালন করে। এর ফলে সমাজে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের আবির্ভাব ঘটে। বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় যাতে অনেক প্রাণহানি ঘটে।
- মুসলমানদের নিজস্ব দল মুসলিমলীগ গঠন (১৯০৬) বঙ্গভঙ্গের অপর রাজনৈতিক ফল। এ দলের চাপের কারণেই মর্লি-মিন্টো ১৯০৯ সালে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা করেন।
- সর্বস্তরের মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও লক্ষ্য সৃষ্টি।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ফল

১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সালের ভেতর গোটা বাংলায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব বাংলায় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৮২.৯ ভাগ যা সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বোচ্চ। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর উন্নতি পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের ফল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

অর্থনৈতিক ফল

- এসময় ব্যাপকভাবে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে পাটের দামও বেড়ে যায়। ১৯০৬-১৯০৭ সালে পাটের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৪ সালের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এর ফলে পূর্ব বাংলার কৃষকদের হাতে বাড়তি অর্থ আসতে থাকে। সন্দেহাতীতভাবে কৃষকদের কাছে তা বঙ্গভঙ্গের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই ধরা পড়ে যা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠনে ভূমিকা রাখে।
- ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি হয়। আমদানি ও রপ্তানি উভয় বাণিজ্যেই এ বৃদ্ধি ঘটে। প্রদেশের সমুদ্র নির্ভর বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯০৫-১৯০৬ অর্থবছরে এই বন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩১৭.৭৬ লক্ষ টাকা।
- প্রদেশের দুর্দশাগ্রস্ত পরিবহণের উন্নয়নের দিকেও নতুন প্রশাসন দৃষ্টি দেয়। যদিও এ খাতে অধিকাংশ ব্যয় ধরা হয় পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চাৎপদ আসামে। প্রদেশের রাস্তাঘাটের জন্য ১৯১১ সালে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের ১৩ জুলাই কলকাতার সাপ্তাহিক 'গণজীবনী'র সম্পাদক কৃষ্ণ কুমার মিত্র 'বয়কট' বা বর্জনের ডাক দেন। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে এ বিরাট প্রতিবাদ সভায় এই বয়কট বা বর্জন নীতি গৃহীত হয়। এরপরও লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা প্রদান এবং ১৫ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন। এর প্রতিবাদে বয় কট বা বর্জন আন্দোলন আরো দুর্বার হয়ে ওঠে উগ্রপন্থি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের সক্রিয় চেষ্টায় তা জাতীয় গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলন ইতিহাসে 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে খ্যাত।

স্বদেশী আন্দোলনকারীরা ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তবে ব্রিটিশ পণ্য বিশেষত বস্ত্র, লবণ, চিনি, সিগারেট এবং বিলাস সামগ্রী বর্জনের পিছনে যেমন একটি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল তেমনি এ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। তা হলো দেশকে স্বনির্ভরশীল করে তোলা এবং বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করা। স্বদেশী আন্দোলনকারীরা ঠিকই ধরে নিয়েছিলেন যে, বয়কট বা বর্জন আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্প এবং বিলাস সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্প-মালিকরা ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করবে।

বঙ্গভঙ্গ রদ

স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার প্রকট রূপ লাভের কারণে ব্রিটিশ সরকার শেষপর্যন্ত নতি স্বীকার করে। ১৯০৬ সালে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফুলার পদত্যাগ করেন। ১৯১০ সাল থেকেই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদের গোপন তৎপরতা চালায়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লি দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। নতুন পরিকল্পনায় বর্ধমান বিভাগ, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রামসহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে বাংলা প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই নতুন বাংলা প্রদেশের রাজধানী করা হবে কলকাতায়। বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে পৃথক করা হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া: বঙ্গভঙ্গ রদে হিন্দুরা সন্তোষ প্রকাশ করে। জাতীয় কংগ্রেস একে স্বাগত জানায়। হিন্দু উগ্রপন্থিরা একে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করে। এমনকি কংগ্রেসের ইতিহাস লেখক পট্টভি সীতারাম রয় লিখেছেন, "১৯১১ সালে কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রদ করে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসনে ন্যায়নীতির পরিচয় দিয়েছে।"

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া: মুসলমানরা এতে আশাহত হয়। তারা বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে হতাশা দেখা যায়। শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানরা এতে উদ্বিগ্ন হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের যে ধারা চালু হয়েছিল এর ফলে মুসলমানরা তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ হয়। নবাব ভিকার-উল-মূলক তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে বলেন, বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে ভবিষ্যতে মুসলমানগণ সরকারের কথা ও কাজের উপর আস্থা রাখতে পারবে না।

মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিবর্তন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব গ্রহণ: প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর নেতৃত্ব ঢাকার নবাব পরিবার, ধনবাড়ির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, চট্টগ্রামের সৈয়দ শামসুল হুদা, টাঙ্গাইলের স্যার এ. কে. গজনবীসহ নেতৃত্ব অভিজাত ও জমিদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের অন্ধ অনুগত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদের পর মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও যুব সম্প্রদায় এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ আনুগত্যের বদলে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া: মুসলমানদের অসন্তোষ ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। বঙ্গভঙ্গ রদের পরের মাসেই (১৯১১ সালের জানুয়ারি) বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে আসেন। ড. রাসবিহারী ঘোষসহ হিন্দু নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংস্থা গঠন করেন। এর সফল পরিণতিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে বহু চেষ্টা করেও তাই ১৯৪৭ সালে যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সফল হয়নি।

খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২)

প্রথম মহাযুদ্ধে 'অটোম্যান-জার্মান অক্ষ শক্তি' গ্রেট ব্রিটেনের নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তির নিকট পরাজিত হয়। বিশ্বযুদ্ধ শেষে গ্রেট ব্রিটেন ও মিত্রশক্তি অটোম্যান সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে এর শক্তিকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই লক্ষ্যে অটোম্যান সাম্রাজ্যের শেষ অংশ তুর্কিয়েকে ১৯২০ সালে অপমানজনক 'স্যাভার্স চুক্তি' স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়। এর প্রতিবাদে ১৯২০ সালে ভারতীয় মুসলমান জনগণ আন্দোলন শুরু করেন। কেননা ভারতীয় মুসলমান জনগণ অটোম্যান সুলতানকে সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা ও ঐক্যের প্রতীক বলে মনে করতো। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। এ আন্দোলন 'খিলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত।

খিলাফত আন্দোলন চলাকালীন সময়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধীজি খিলাফত আন্দোলনের প্রতিও তার সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এর ফলে খিলাফত আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। গান্ধীজি খিলাফত আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান নেতায় পরিণত হন। ১৯২১ সালের ৫ নভেম্বর কংগ্রেস 'আইন অমান্য আন্দোলন' শুরু করলে অহিংস আন্দোলন দ্রুত সহিংস রূপ ধারণ করতে থাকে। ১৯২২ সালে উত্তর প্রদেশের গোরখপুরের নিকটবর্তী চৌরিচৌরা নামক স্থানে আন্দোলনরত জনতার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ একটি ঘরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্ষিপ্ত জনতা ঐ ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে ৫ ফেব্রুয়ারি একজন দারোগাসহ ২২ জন পুলিশের মৃত্যু ঘটে। গান্ধীজি আন্দোলনের এ সহিংসরূপ দেখে মর্মাহত হন এবং আকস্মিকভাবে ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বারদৌলীতে কংগ্রেসের কার্যকরী সভায় আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এ সময় তুরস্কের (বর্তমান তুর্কিয়ে) বিপ্লবী নেতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের ক্ষমতা দখল করেন। ১৯২৩ সালের ১৭ নভেম্বর তিনি তুরস্ককে 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা এবং 'খিলাফত' তথা তুরস্ক 'সালতানাত' কে বাতিল ঘোষণা করেন। এর ফলে ১৯২৪ সালে ভারতে খিলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অসহযোগ আন্দোলন

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের পেছনে বিভিন্ন কারণ ছিল। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির কারণে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নতুন ধারার জন্ম দেয়। ১৯১৯ সালে সরকার 'রাওলাট আইন' পাস করে। এই আইনে যেকোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। এই আইন ভারতের সর্বস্তরের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধীর ডাকে এই নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল হরতাল পালিত হয়।

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য কংগ্রেস বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক তদন্ত কমিটি গঠন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। সরকারের দমননীতির পাশাপাশি চলে সংবাদপত্রে হস্তক্ষেপ। তাছাড়া মহাযুদ্ধে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দার কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে ১৯২৩ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান। ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২১-২২ সালে এই আন্দোলন সর্বভারতীয় গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

তেভাগা আন্দোলন

'মোট উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে কৃষক, একভাগ পাবে জমির মালিক' এ দাবি থেকে বর্গা চাষীদের যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তা তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সালে এ আন্দোলন চলে। ভূমি মালিক এবং ভাগ চাষিদের মধ্যে উৎপাদিত শস্য সমান দুইভাগ করার বিরুদ্ধে বর্গাদাররা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। দুটি কারণে এটিকে বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমত, তারা দাবি করে যে, অর্ধেক ভাগাভাগির পদ্ধতি অন্যায়। উৎপাদন যাবতীয় শ্রম ও অন্যান্য বিনিয়োগ করে বর্গাচাষি। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ, শ্রম এবং অবকাঠামোতে ভূমি মালিকের অংশগ্রহণ থাকে অতি নগণ্য। এ কারণে, মালিকরা পাবেন ফসলের অর্ধেক নয়, এক-তৃতীয়াংশ। দ্বিতীয়ত, বর্গাচাষিরা দাবি করেন যে, উৎপাদিত শস্যের সংগ্রহ মালিকদের খলানে রাখা এবং সেখান থেকে সমান সমান খড় ভাগাভাগির নিয়ম আর মানা হবে না। সংগৃহীত ফসল থাকবে বর্গাচাষিদের বাড়িতে এবং ভূমি মালিক খড়ের কোনো ভাগ পাবে না। মূলত তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত করেন প্রাদেশিক বাংলার প্রাদেশিক কৃষকসভার কমিউনিটি কর্মীরা। আন্দোলনের প্রধান নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন হাজী দানেশ, অজিত বসু, বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, ইলামিত্র, কংসারী হালদার, সুশীল সেন, নুর জালাল প্রমুখ। এ আন্দোলনের জনক নামে খ্যাত হাজী মোহাম্মদ দানেশ। তেভাগা আন্দোলন বাংলার ১৯টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা, ময়মনসিংহ, যশোর এবং চব্বিশ পরগনা জেলায়। তেভাগা আন্দোলন সফল হওয়ার ফলে শতকরা ৪০ ভাগ বর্গাচাষি ভূমি মালিকদের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় তেভাগা প্রাপ্ত হন। এ আন্দোলন আব ওয়াব এর নামে বলপূর্বক অর্থ আদায় বন্ধ বা সীমিত করে। তবে পূর্ব বাংলার জেলাসমূহে এ আন্দোলনটির সাফল্য ছিল সীমিত। ১৯৪৮-৫০ সালের দিকে তেভাগা আন্দোলন আরেক দফা সংগঠিত হয়। এই আন্দোলন পূর্ববহু জমিদার অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

১৯১১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই সংগ্রাম জোরদার হয়েছিল। তবে এর পরেও বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র আক্রমণের ঘটনা ঘটে। প্রথম পর্যায়ের বিপ্লবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় নিয়োজিত প্রফুল্ল চাকির আত্মহত্যা এবং ধরা পড়ার পর ক্ষুদিরামের ফাঁসি। এছাড়া মানিকতলা বোমা হামলাসহ নানা অভিযোগে বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে ঐ সময় ফাঁসি দেওয়া হয়। বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে কারাবন্দি ও দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। এই সমস্ত চরম দমননীতির কারণে প্রথম পর্যায়ে সশস্ত্র বিপ্লব স্তিমিত হয়ে যায়।

গ্রেপ্তারের পর ক্ষুদিরাম বসু

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয় ১৯১২ সালে। এই আন্দোলন কলকাতাকেন্দ্রীক হলেও ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। এই সময় বিপ্লবীরা আবার হত্যা, বোমা হামলা, ডাকাতি ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় গোপনে বোমার কারখানা স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে কলকাতা ও পূর্ব বাংলার যশোর, খুলনায় অনেক সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ১৯১২ সালের শেষের দিকে দিল্লিতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনায় লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার জন্য বোমা হামলা চালানো হয়। হার্ডিঞ্জ বেঁচে যান। কিন্তু, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে ধরার জন্য ইংরেজ সরকার এক লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে।

১৯১৬ সালের ৩০শে জানুয়ারি ভবানীপুরে হত্যা করা হয় পুলিশের ডেপুটি সুপার বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে। এভাবে হত্যা, খণ্ডযুদ্ধের সংখ্যা বেড়ে গেলে সরকার প্রতিরক্ষা আইনে বহু লোককে গ্রেফতার করে। ১৯২২ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার ও পুলিশি নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বৃদ্ধি পায় বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড। বিপ্লবীরা অত্যাচারী পুলিশ সদস্যদের হত্যার আহ্বান জানিয়ে লালবাংলা শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশ করে। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে ইংরেজ সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করে। এই অর্ডিন্যান্সের ফলে অনেক বিপ্লবী কারারুদ্ধ হলে বিপ্লবী কার্যক্রম কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে।

১৯৩০ সালে মাস্টার দা সূর্যসেন গনেষ ঘোষ, লোকনাথ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, সুহৃদ রয় প্রমুখ বিপ্লবীদের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুট করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা অস্ত্র লুটে অক্ষম হলেও অস্ত্রাগারের টেলিগ্রাফ লাইন বিচ্ছিন্ন করেন। সংঘাতে ব্রিটিশ পুলিশবাহিনীর বেশ কিছু পুলিশ হতাহত হয়। ঘটনার ফলস্বরূপ সূর্যসেনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অনেক নির্যাতনের পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

নমুনা লিখিত প্রশ্ন

০১। প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। বাংলায় মুসলিম শাসনের তৎকালীন চিত্র বর্ণনা করুন।
০২। পলাশির যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। উপমহাদেশের শাসন ব্যবস্থায় পলাশির যুদ্ধের প্রভাব বর্ণনা করুন।
০৩। বঙ্গভঙ্গ কি? তৎকালীন বাংলায় বঙ্গভঙ্গের প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।
০৪। সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে লিখুন। ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতায় এ আন্দোলনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
০৫। বাংলা-কেন্দ্রীক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
০৬। স্বদেশি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করুন এবং এর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
০৭। 'ক্ষমতাবিহীন দায়িত্ব, দায়িত্ববিহীন ক্ষমতা- দ্বৈত শাসনের মূল কথা' ব্যাখ্যা করুন।

নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর

০১. বঙ্গ ও বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখুন **১০**

আজকের বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ এলাকাকে প্রাচীনকালে বলা হতো 'বাংলা'। তবে প্রাচীন যুগে এই সম্পূর্ণ দেশটির একক নাম বাংলা ছিল না। হিন্দু ও বৌদ্ধদের শাসনকালে এই দেশ অনেকগুলো অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি অংশের ছিল ভিন্ন ভিন্ন নাম। মধ্যযুগে যখন এদেশে মুসলমান শাসকদের অধিকারে আসে তখন থেকে দেখা যায় দেশটির নামের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসছে। বাংলা ভাষায় কথা বলা লোকেরা যে অঞ্চলে বাস করত এসময়ে তারই নাম হয় বাংলা। মুসলমান শাসন যুগ অর্থাৎ মধ্যযুগের শুরুর দিকে মুসলিম শাসক ও ইতিহাস লেখকগণ 'বঙ্গ' বা 'বাঙলা (বাংলা)' বলতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাকে বুঝাতেন। এ যুগের সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াসশাহ প্রথম পুরো বাংলাকে নিজের অধিকারে আনেন। ইতিহাস লেখকগণ তখন তাঁকে উপাধি দেন 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' এবং 'সুলতানই বাঙ্গালা'। এ সময় থেকেই পুরো দেশটি বাংলা নামে পরিচিত হয়। রাঢ় ও লক্ষণাবতীর (গৌড়) লোকেরা ইলিয়াস শাহের সময় থেকেই বাঙালি বলে পরিচিত হতে থাকে। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর যখন বাংলা অধিকার করেন তখন থেকে 'বঙ্গাল' শব্দটা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। অনেককাল পরে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের অধিকারে চলে যায় এদেশ। ধীরে ধীরে পুরো ভারতের ক্ষমতা দখল করে ইংরেজরা। আমাদের এ দেশটি ব্রিটিশদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ইংরেজরা তখন এই প্রদেশকে বলত 'বেঙ্গল'। বেঙ্গল নামটি ছিল ইংরেজি ভাষায় আর বাংলা ভাষায় বলা হতো বাংলাদেশ।

বাংলা নামের উৎপত্তি

- 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।
- রামায়ণ ও মহাভারত বঙ্গ নামের উল্লেখ আছে।
- বর্তমানে যে ভূ-খণ্ড নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত, পূর্বে এর অধিকাংশ অংশ বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল।
- মুসলিম শাসনামলে সর্বপ্রথম এ অঞ্চলকে 'বাংলা' বা 'বাড়ালা' নামে অভিহিত করা হয়।
- সম্রাট আকবরের শাসনামলে সমগ্র বাংলাদেশ সুব-ই-বাংলা হিসেবে পরিচিত হয়।

বঙ্গ একটি প্রাচীন নাম। 'ঐতরেয় আরণ্যক' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সেলিম বলেন যে, হযরত নূহ (আঃ)- এর পুত্র হিন্দ এর পুত্র বঙ্গ থেকে বাঙালি জাতির উৎপত্তি (রিয়াজ উস সালাতিন)। আবুল ফজল তার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বলেন, বাঙালার প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। আদিকালে এখানে জলাবদ্ধতা রোধ করার জন্য শাসকগণ সমগ্র প্রদেশের পাশে ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ বিস্তৃত বাঁধ নির্মাণ করতেন। এগুলিকে 'আল' বলা হতো। বঙ্গের সাথে 'আল' যুক্ত হয়ে 'বাঙ্গাল' বা বাঙালা নামের উৎপত্তি। মহাভারতের আদিপর্বে বঙ্গ জনপদের উল্লেখ আছে। পাল বংশ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন বঙ্গ জনগণ দুভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ নামে পরিচিত হয়। বর্তমানকালের বঙ্গ অঞ্চল বলতে ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীকে বুঝায়। মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে রঘুর বিজয় কাহিনি হতে অনুমিত হয় বঙ্গের অবস্থান ছিল ভাগীরথী ও পদ্মার স্রোত অন্তর্বর্তী এলাকা অর্থাৎ গঙ্গারিডই অঞ্চল। সুকুমার সেন মনে করেন যে বঙ্গ শব্দটি চীনা তিব্বতীয় এবং বঙ্গের অংশের অর্থ জলাভূমি। অর্থাৎ এ জলাভূমির জনগোষ্ঠীর আবাসভূমিই হলো বঙ্গ জনপদ। সম্ভবত বর্তমান মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, ঢাকা, যশোর, পাবনা, বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর এবং রাজশাহী জেলার কিছু অংশ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

০২. দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলাফল লিখুন। **০৫**

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীরকাশিম পরাজিত হওয়ার পর ইংরেজরা বাংলার শাসন ব্যবস্থায় সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করে এবং বাংলার ভাগ্যবিধাতা হয়ে যায়। ১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ দিল্লির দুর্বল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। ফলে দেওয়ান হিসেবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব প্রশাসন ও দেশ রক্ষার ভার থাকে কোম্পানির হাতে, অন্যদিকে নিযামত বা প্রশাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব থাকে নবাবের হাতে। ইতিহাসে একে দ্বৈতশাসন হিসেবে অভিহিত করা হয়। ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা এদেশের জনগণের জন্য ছিল এক বিরাট অভিশাপ। এ ব্যবস্থায় প্রশাসনের মূল ক্ষমতা অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষমতা থেকে গেল কোম্পানির হাতে। শাসনের দায়িত্ব নবাবের হাতে ছিল অথচ অর্থনৈতিক কোনো ক্ষমতা ও অধিকার তাঁর ছিল না। এভাবে নবাব ক্ষমতাহীন হয়ে যান এবং প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। রাজস্ব হার বাড়ানো-কমানোর দায়িত্ব থেকে গেল কোম্পানির হাতে। কোম্পানির ইচ্ছামতো উচ্চ হারে রাজস্ব নির্ধারণ, কোম্পানি কর্মচারীদের দুর্নীতি ও লুঠপাট, কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচার, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে দেশের দুরবস্থা দিন দিন বাড়তে থাকে। দেশের অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। বাংলার শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধি ধ্বংস হয়ে যায়। রাজস্ব আদায়কারী আমলাদের অত্যাচারের ভয়ে বহু রায়ত পেশা পরিবর্তন করে বা অন্যত্র পালিয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে কৃষির অবনতি, উপরন্তু অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬ সনে) দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।